ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

# আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা ৪ আশ্বিন ১৪১৯ মঙ্গলবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ শহর সংস্করণ ৪ টাকা

# জগদীশচন্দ্র ও মার্কনি দু'জনেই অসামান্য

**দু'জনের সাফল্য নিজের নিজের জায়গায়। বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসরণ করে সেই সাফল্য এবং তার প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেছেন দেবতোষ গুহ**

স্কটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-১৮৭৯) জগদীশচন্দ্র বসুর (১৮৫৮-১৯৩৭) থেকে বয়সে প্রায় ২৭ বছরের বড়। ম্যাক্সওয়েলই প্রথম নিজের মতো করে একসঙ্গে গেঁথে ফেলেছিলেন তড়িৎ ও চুম্বক নিয়ে বলা আঁদ্রে মারি অ্যাম্পিয়ার, কার্ল ফ্রেডরিক গাউস আর মাইকেল ফ্যারাডের আলাদা আলাদা সূত্রগুলো। সময়টা ১৮৬৪ সাল। তিনি আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন অঙ্ক কষে। বিশ্বকে উপহার দিলেন এক নতুন সম্ভাবনা— তড়িৎ শক্তি ও চৌম্বক শক্তি শুধু মাত্র একে অপরকে জড়িয়েই থাকে না, সুযোগ পেলে সৃষ্টি করতে পারে এক অদৃশ্য তরঙ্গ, যা কিনা ঢেউ-এর পরে ঢেউ তুলে আলোর সমান গতিবেগ নিয়ে ছুটে যেতে পারে আকাশে বাতাসে। ম্যাক্সওয়েলের এই তত্ত্বই আভাস দিয়েছিল বেতার বা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের। সঙ্গে ম্যাক্সওয়েলের মনে উঁকি দিল আর একটি সম্ভাবনা: আলোও তবে এক ধরনের তড়িৎচুম্বকীয়! বিজ্ঞানী মহলে উঠল নানা প্রশ্ন।

এক দল বিজ্ঞানী উঠেপড়ে লাগলেন ম্যাক্সওয়েলের কথাগুলোর সত্যতা যাচাই করতে। লেগে গেল প্রায় ২৪ বছর। তরুণ জার্মান অধ্যাপক হাইনরিশ হার্জ (১৮৫৭-১৮৯৪) সফল হলেন ১৮৮৮-তে। তাঁর কলেজ ল্যাবরেটরির এক প্রান্তে সৃষ্টি করলেন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ নিজের তৈরি ডাইপোল অ্যান্টেনার সাহায্যে। ম্যাক্সওয়েল যেমন বলেছিলেন, ঘটলও তাই। ল্যাবরেটরির আর এক প্রান্তে সেই তরঙ্গই ধরা পড়ল হার্জের তৈরি লুপ অ্যান্টেনাতে। তিনি মাপলেন সেই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৫ মিটারের কাছাকাছি। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বের জয়জয়কার শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু আলো যে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, ম্যাক্সওয়েলের এই অনুমানের প্রমাণ কোথায়? হার্জ যখন এতটা পেরেছেন, বাকিটা তিনিই পারবেন। সমস্যা বাধাল হার্জের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। মাপে তা এত বড় যে, আলোর ধর্ম তা দিয়ে বোঝানো ভারী মুশকিল। জগদীশচন্দ্র তখন সবে ৩০। সে বছরই তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করেছেন। মনে হয় হার্জের গবেষণার এই [illegible] করতে। ১৮৯৪-৯৫-তেই এল সাফল্য। জনসমক্ষে তাঁর তৈরি ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ট্রান্সমিটার থেকে তড়িৎচুম্বকীয় সংকেত পাঠালেন অন্য এক ঘরে রাখা রিসিভারে। এই আবিষ্কারের কথা কমবেশি আমরা প্রায় সবাই জানি। আর সে প্রসঙ্গ এলেই আমরা প্রায় প্রত্যেকেই মনে করি, গুগলিয়েলমো মার্কনির (১৮৭৪-১৯৩৭) নোবেল প্রাইজটা (১৯০৯) পাওয়া উচিত ছিল জগদীশচন্দ্রেরই। অনেকের আবার বদ্ধমূল ধারণা, জগদীশচন্দ্রই বেতারের জনক, মার্কনি কখনওই নন।

আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না যে, এঁদের দু'জনের কেউই বেতারের জনক নন। ইতিহাস যা বলে তা চমকপ্রদ। সেটা ১৮৬৪ সাল। ডাক্তার লুমিস নামে আমেরিকান এক দন্তচিকিৎসক ছাপিয়ে ফেললেন অয়্যারলেসে সংকেত পাঠাবার বর্ণনা সহ একটি প্রবন্ধ। হাতেনাতে করে দেখালেন ১৮৬৬-তে। উড়ন্ত ঘুড়িতে





ইলেকট্রিক তার বেঁধে বেতার সংকেত পাঠালেন ব্লু রিজ পাহাড়ের একটি চুড়ো থেকে ২২ কিলোমিটার দূরের আর একটি চুড়োয়। নাম দিলেন 'এরিয়াল টেলিগ্রাফ'। সে বছরই আমেরিকা থেকে লুমিস পেয়ে গেলেন পৃথিবীর প্রথমতম অয়্যারলেস পেটেন্ট, মার্কনির ব্রিটিশ পেটেন্টের ৩১ বছর আগে। কিন্তু লুমিস বুঝতেই পারেননি তাঁর পরীক্ষার রহস্যটা কী? সেটা বুঝতেই যে দরকার ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব।

তা হলে মার্কনিকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল কেন? বেতার আবিষ্কারের জন্য কি? তা-ও আবার একা নন, যুগ্ম ভাবে জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ফার্দিনান্দ ব্রাউনের সঙ্গে। নোবেল প্রাইজ ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখা যাক সাইটেশন অর্থাৎ 'স্বীকৃতি-বাক্য' ঠিক কী বলছে। লেখা আছে: 'অয়্যারলেস টেলিগ্রাফির ডেভেলপমেন্টে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে গুগলিয়েলমো মার্কনি ও কার্ল ফার্দিনান্দ ব্রাউনকে যুগ্ম ভাবে ১৯০৯-এ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হল'। লক্ষণীয় শব্দটি হল 'ডেভেলপমেন্ট'।

না, মার্কনি ও জগদীশচন্দ্রের আসল কৃতি ঠিক কোথায়। ছোট করে বললে, মার্কনিই প্রথম, যিনি ম্যাক্সওয়েল থেকে শুরু করে হার্জ, টেসলা, পোপভ, রিঘি, জগদীশচন্দ্র, অলিভার লজের মতো প্রায় দেড় ডজন বিজ্ঞানীর টুকরো টুকরো আবিষ্কারকে অর্থবহ করে তুলতে পেরেছিলেন। আটলান্টিক পেরিয়ে এক মহাদেশ থেকে ৩৫০০ কিলোমিটার দূরে আর এক মহাদেশে বেতার সংকেত পৌঁছে দিয়েছিল মার্কনির যুগান্তকারী পরীক্ষা। ১৯০১ সালে, যখন অ্যান্টেনা বিষয়টাই কেউ ভাল করে বুঝে উঠতে পারেনি, মার্কনি তখনই পরিণত অ্যান্টেনা সিস্টেম তৈরির স্পর্ধা দেখাতে পেরেছিলেন। সেখানেই মার্কনির আসল কৃতিত্ব।

জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব অন্যত্র। মাইক্রোওয়েভ ও মিলিমিটারওয়েভের জনক তিনিই। ট্রান্সমিটার-রিসিভার-অ্যান্টেনা— পুরো কমিউনিকেশন সিস্টেমটাই একা বানিয়ে ফেলেছিলেন ১৮৯৪-তে। কেন? ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গই তাঁর প্রয়োজন, আলোর পরীক্ষাগুলো করতে হবে যে। তরঙ্গ ছোট করতে গিয়েই তৈরি করে ফেলেছিলেন মাইক্রোওয়েভ। অত ছোট তরঙ্গদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রচলিত ধারণার বাইরে তাঁর নতুন কিছু ভাবতে হল। বানিয়ে ফেললেন অবাক করা কিছু যন্ত্রাংশ। তাদের অনেকগুলোই এখন মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তির সঙ্গে মিশে গেছে।

মাইক্রোওয়েভ কি প্রতিফলন প্রতিসরণের মতো আলোর সূত্রগুলো মেনে চলে? জগদীশচন্দ্র পরীক্ষাগুলো নিপুণ ভাবে করতে শুরু করলেন, যা হার্জের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে জগদীশচন্দ্র করে ফেললেন একটি অসাধারণ পরীক্ষা। নিজের তৈরি স্পেকট্রোমিটারে কাচের একটা টুকরো বসিয়ে মাইক্রোওয়েভ উৎস কাজে লাগিয়ে মেপে ফেললেন পূর্ণ প্রতিসরণ বা টোটাল রিফ্লেকশন, আর বের করে ফেললেন কাচের ডাইইলেকট্রিক কনস্টান্ট ২.৩। এ বার মাইক্রোওয়েভ উৎসটিকে সরিয়ে নিয়ে সে জায়গায় ব্যবহার করলেন সোডিয়াম আলো, মাপা হল সেই টুকরোটিরই প্রতিসরাঙ্ক বা রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স ১.৫৩। আলো যদি সত্যিই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হয়, তবে ম্যাক্সওয়েলের কথা অনুযায়ী রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সের বর্গফল হওয়া উচিত ডাইইলেকট্রিক কনস্টান্টের সমান। আশ্চর্য! জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষা সে কথাই বলছে। এই ফলাফল ছাপা হল ১৮৯৭ সালে ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটি প্রসিডিংস-এর ৬০ নম্বর খণ্ডে। সত্যি বলতে কি, আমরা ক'জন খেয়াল রাখি যে এই পরীক্ষাই প্রথম প্রমাণ করেছিল আলো তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। ম্যাক্সওয়েল-এর অনুমানই সত্য। আর জগদীশচন্দ্রই সেই সত্যদ্রষ্টা। তিনিই বলতে পেরেছেন— তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ মাত্রই তো 'আলো'— চোখে ধরা দিলে 'দৃশ্য', না দিলে 'অদৃশ্য' আলো।

---

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের